কৃষক, কর্পরেট পুঁজি ও সামাজিক ন্যায়

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

শিল্প এবং পরিষেবাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাজ যত বাড়তে থাকে, কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহার করার গুরুত্ব ততই বাড়তে থাকে। জোর ক'রে কৃষি জমি দখল করার চেষ্টা না করলেও এই প্রবণতা বন্ধ হয় না, কেননা এর পিছনে থাকে একটা বাস্তব তাগিদ। তাগিদটা অর্থনৈতিক। এক খন্ড জমি কৃষি কাজে ব্যবহার করলে যা আয় হয়, সে জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করলে আয় পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি। আয়টা কত বেশী তা বোঝা যায় কৃষির বাজার দাম দিয়ে। শিল্প বা পরিষেবা যেখানে গড়ে ওঠে, অর্থাৎ অকৃষি কাজের গুরুত্ব যেখানে বেশি, জমির দামও সেখানে বেশি।

জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করলে আয় যে বেশি হয়, তার কারণ কি? জমির ওপর যখন ফসল ফলানো হয়, তখন একজন শ্রমিক যতটা উৎপাদন করতে পারে, টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ মাপলে দেখা যাবে, জমিতে যদি কারখানা বা পরিষেবা গড়ে ওঠে কৃষির তুলনায় টাকার অঙ্কে শ্রমিক পিছু তার উৎপাদন হয় অনেক বেশি। এর কারণ অবশ্যই কৃষি ও অকৃষির মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যবধান। কৃষি যত আধুনিকই হোক তার যা প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি থাকে, অকৃষি কাজে প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি তার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। ফলত, কৃষির তুলনায় অকৃষি কাজে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা থাকে বেশি। মার্কস্ -এর ভাষায় বললে, কৃষিতে পুঁজির আঙ্গিক গঠন (অর্থাৎ অশ্রম : শ্রম) সব সময়ই থাকে শিল্পের (এবং পরিষেবা, মার্কস যার কথা বলেন নি, তাঁর সময়ে এর গুরুত্ব ছিলো কম) তুলনায় কম। সুতরাং কৃষিতে শ্রমিক পিছু উৎপাদন কম থাকবে, আর সে জন্যই কৃষিতে যা আয় হবে তা অকৃষির তুলনায় কমই থাকবে।

এই যুক্তিতে সব কৃষি জমিই অকৃষি কাজে চলে যাবার কথা। পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই সেটা কিন্তু ঘটেনি। না ঘটার কারণ আছে। শিল্প বা পরিষেবার যত বেশি উৎপাদন ক্ষমতা থাক না কেন, কৃষি থেকে ফসল উৎপাদন বন্ধ হ'য়ে গেলে এর কোনোটাই টিকবে না, কেন না জীবন্ত শ্রম ব্যবহার করতে হ'লে শ্রমের মালিক অর্থাৎ শ্রমিকের কর্মক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি যা কাজে লাগিয়ে ফসল ভিত্তিক খাদ্যের বিকল্প জোটানো যায়, যার জন্য কৃষি কাজ অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে। শিল্প বা পরিষেবা টেঁকাতে হলে লাগে কৃষি, তার জন্য জমি লাগে। যদি কৃষি জমির পরিমাণ কমতে থাকার দরুণ কৃষির ফলন কমে, তবে কৃষি পণ্যের আপেক্ষিক দাম বাড়তে থাকে, ফলত, শিল্প বা পরিষেবা পণ্যের উৎপাদনেও বাড়ে মজুরী অঙ্ক, মজুরীর অঙ্ক বাড়লে লাভের অঙ্ক কমে, আর লাভের অঙ্ক কমলে বিনিয়োগের অর্থে টান পড়ে। কৃষি পণ্যের দাম বাড়লে মজুরী না বাড়িয়ে উপায় থাকে না, কেননা শ্রমশক্তির মালিকের তা না হ'লে কাজ ক'রে পোষাবে না— সে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করতেই আসবে না। কৃষি পণ্যের দাম বাড়লে তাই মজুরী বাড়বে এবং তার ফলে মুনাফা এবং সেই সূত্রে বিনিয়োগের হার কমতে থাকবে। নীট ফল দাঁড়াবে— শিল্প ও পরিষেবার বিকাশও মন্থর হয়ে পড়বে। সব জমি অকৃষি কাজে চলে যাওয়া তাই অসম্ভব; এমন কি বেশ কিছুটা জমি অকৃষি কাজে চ'লে গিয়ে যদি খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাহ'লেও শিল্প ও পরিষেবার হাল খারাপ হ'য়ে পড়বে। কৃষিতে পুঁজির আঙ্গিক গঠন কম থাকা সত্ত্বেও কৃষিকে তাই টেকাতেই হয়। কৃষিতে আয় কম থাকায় কৃষি কাজ বন্ধ করে সে জমি বিক্রি ক'রে দেবার প্রবণতা ঠেকাতে এমন কি শিল্পোন্নত দেশেও কৃষিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করে।

আজকাল একটা কথা উঠেছে, কৃষি জমি রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। পশ্চিমবঙ্গে চাষ ক'মে গেলে ঝাড়খণ্ড বা বিহার থেকে সস্তার চাল নিয়ে আসা যাবে; তার জন্য যা টাকা লাগবে উচ্চমূল্যের শিল্প পণ্য বিক্রি ক'রে অনায়াসে তার ব্যবস্থা করা যাবে। যুক্তিটা রাজ্যবাসীর কাছে বেশ লাগসই সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রশ্নটা উঠতেই পারে, ঝাড়খন্ড বা বিহার কেন উচ্চমূল্যের শিল্প পণ্য তৈরী করে বেশি লাভ করার চেষ্টা করবে না তার কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে? বস্তুত এটাই আসল প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গে পুঁজির উচ্চতর আঙ্গিক গঠনের দায় বইবে বিহারের ছত্তিশগড়— এগুলি যুক্তি হিসেবে টেকসই নয়। আলোচনাটা করতে হবে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে। এ দেশে নীট কৃষি (কার্যত) জমির পরিমাণ ১৪ কোটি হেক্টর। এ থেকে যা উৎপাদন, তাতে গড়পড়তা ভারতবাসীর জন্য বরাদ্দ থাকে দৈনিক ৪৯৫ গ্রাম খাদ্য শস্য। কৃষি ক্রমশ 'অলাভজনক' হয়ে পড়ায় যদি কৃষি জমি অকৃষি কাজে বিক্রি করে দেবার প্রবণতা বাড়ে, এবং 'অলাভজনক' কৃষিতে যদি প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিনিয়োগ কমে (যার লক্ষণ ইতিপূর্বে ইতিমধ্যেই দেখা দিচ্ছে) তাহ'লে খাদ্যশস্যের যোগান কমতে এবং আমাদের ইতিপূর্বে উল্লেখিত যুক্তি অনুসারে শেষ পর্যন্ত শিল্প ও পরিষেবায় বিনিয়োগও কমতে থাকবে। কৃষি জমির অকৃষিকাজে ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি তাই জাতীয় স্তরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা নিয়ে আলোচনা করা জরুরী।

বিরুদ্ধবাদীরা বলতে পারেন, এটা সত্যিই অত গুরুত্বপূর্ণ কিনা, তা নিয়ে তবুও প্রশ্ন আছে। উদারনীতির দৌলতে এখন রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানী রপ্তানি যেমন সহজ হ'য়ে গেছে, তেমনিভাবেই সহজ হয়ে গেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্য শস্য আমদানী রপ্তানি। ভারতে যদি খাদ্যের উৎপাদন কমে, তাতে শঙ্কার কারণ নেই। কৃষি জমিতে আই-টি-পার্ক গড়ে যে উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরি হবে, তা রপ্তানি করে সেই রপ্তানির অর্থের সামান্য অংশ ব্যয় করেই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করা যায়। তাতে ভারতের আখেরে লাভই হবে। যুক্তিটা যদিও

বেশ মজবুত মনে হয়, উল্লেখ করা দরকার, এই যুক্তিটা এমন কি আমেরিকা - জাপানও মানে না। তারা ভর্তুকি দিয়ে নিজের দেশের কৃষি জমিকে তোয়াজ করে, যাতে তারা 'অলাভজনক' কৃষি কাজ থেকে বিরত না হয়। কারণটা হ'ল, খাদ্য নিরাপত্তা বিদেশের হাতে তুলে দেওয়ার রাজনৈতিক মূল্য যে অপরিসীম এটা তারা জানে। আমাদের দেশে শিল্পায়ন নগরায়ণের জন্য যারা উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে, তাদের এই বোধটাই সম্ভবত নেই।

যাই হোক, মোটের ওপর কথা হ'লো কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক হবার সঙ্গত কারণ আছে। ভারতের প্রেক্ষাপটে এই সতর্কতার বিষয়টি জরুরী হ'য়ে পড়েছে এই কারণে যে ইদানিং এ দেশে বড় শহরের আশে পাশে বিপুলভাবে বাড়ছে জমির চাহিদা। চাহিদা - বৃদ্ধির এই তীব্রতার উৎস কী, তার অর্থনৈতিক ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিতে— এসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

জমির চাহিদা বৃদ্ধির উৎস

অকৃষি কাজ অর্থাৎ বাড়ী ঘর বানানো, রাস্তাঘাট তৈরি করা, ফ্যাক্টরি করা, বাণিজ্য কেন্দ্র গড়া, নতুন নগর গড়া, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য জলাধার বানানো, বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন থাকে। স্বাধীনতার সময় এসব কাজে এদেশে যতটা জমি ব্যবহার করা হ'তো তার মোট পরিমাণ ছিলো ১কোটি হেক্টর। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে এদেশে যে রাষ্ট্র উদ্যোগে শিল্পায়নের কর্মসূচী নেওয়া হয় তার ফলশ্রুতিতে অকৃষি কাজে জমি ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধির চাপ অনেকটাই বহন করে চাষযোগ্য কিন্তু চাষ হয়না এমন জমি। নীট কর্ষিত জমি অর্থাৎ চাষের জমিও এই সময়টায় বাড়তে থাকে— সেটা বাড়ে চাষযোগ্য কিন্তু চাষ হয় না এমন জমির কিছুটা চাষের কাজে লাগিয়ে। যাইহোক, অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ এই সময়টা থেকে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ১৯৮০ সালে এসে দাঁড়ায় ২ কোটি হেক্টরে। তারপর ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ২০০৪ সালের মধ্যে এই ধরণের ব্যবহারে নিযুক্ত জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টরে। দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর প্রথম চার দশকে অকৃষি কাজে নিযুক্ত জমির পরিমাণ যতটা বেড়েছে, বিশ্বায়নের পর মাত্র পনেরো বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তার ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ অকৃষি কাজে জমির ব্যবহার স্বাধীনতার পর প্রথম ৪০ বছরে যা বেড়েছে বিশ্বায়নের পনেরো বছরে তা বেড়েছে তার অর্ধেক। এর সঙ্গে এই কথাটাও বলা দরকার যে ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যেও এই অকৃষি কাজে জমির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তার কতটা আসছে কৃষি জমির ব্যবহারের পরিবর্তন থেকে তার সরকারী কোনো তথ্য নেই। তথ্য না থাকার কারণ হলো কাগজপত্রে জমির ব্যবহারের পরিবর্তন নথিবদ্ধ হয় এই পরিবর্তন ঘটে যাবার বেশ কিছুটা পরে। বাস্তবে অকৃষি কাজে জমি ব্যবহার বৃদ্ধির অনেকটাই এখন যে ঘটছে কৃষি জমির ব্যবহারের পরিবর্তন থেকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হায়দ্রাবাদের আশেপাশে গত পাঁচ বছরে ৯০ হাজার হেক্টর জমি চাষের কাজের বাইরে চলে গেছে। ফলত হায়দ্রাবাদ শহরের চারপাশের পঁচিশটা মন্ডলে কৃষি এখন আর জীবিকার প্রধান উৎস নয়। মুম্বাই শহরের নভী মুম্বাই -এর লাগোয়া রায়গড় জেলায় ১০১২০ হেক্টর জমিতে ২০০৬ সালে নোটিশ দেওয়া হ'য়ে গেছে অধিগ্রহণের জন্য। এই জমির বড় অংশটাই কৃষি জমি। জমিটা দেওয়া হবে রিলায়েন্সকে। ওখানে গড়ে উঠবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। এলাকাটা কত বড় তা অনুমান করা যায় যে এই তথ্যটি নজরে রাখলে যে মুম্বাই শহরের যা এলাকা, এই ১০ হাজার হেক্টর জমি হ'লো তার এক তৃতীয়াংশ। (এটা নিয়ে গোলমাল দেখা দেবার পর প্রস্তাবিত বিশেষ অঞ্চলের সাইজ ছোট করার কথা হয়েছে। কিন্তু নভী মুম্বাই -এর সঙ্গে এই এলাকাটি যুক্ত করার জন্য যে সেতু নির্মাণের প্রকল্প আছে তা দ্রুত রূপায়িত হ'চ্ছে। ফলত এ দিকের জমি ইতোমধ্যেই জমির দালালদের হাতে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চল হোক বা না হোক, রায়গড়ে কৃষি জমির ওপর আক্রমণ অব্যহতই থাকবে।) দেশের অন্যান্য বড় শহরেও চিত্রটা একই ধরণের। জমির চাহিদা বাড়ছে শহরের প্রয়োজনে। হাউসিং এস্টেট, আট লেনের রাস্তা, নূতন এয়ারপোর্ট, শপিং মল, পার্ক—সব কিছুর জন্য শহরে এই চাহিদা বাড়ছে। তাছাড়া আছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। সাইজ ছোটো ক'রে দেবার পরও এদেশে এখন যে ২১২টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন করা হয়েছে তার জন্য দরকার ৩৩৭৬১ হেক্টর জমি, যার অনেকটাই আসবে কৃষি জমি অধিগ্রহণ ক'রে।

ইদানিং অকৃষি কাজের জন্য জমির যে চাহিদা আসছে তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'লো এই চাহিদার অনেকটাই আসছে কর্পরেট ক্যাপিটাল বা বেসরকারী বড় পুঁজির কাছ থেকে উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কথাই ভাবা যাক। এ দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন (২০০৫) -এর মূল কথা হলো এই অঞ্চলগুলির অধিকাংশই হবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি নগর যেখানে পরিকাঠামো থাকবে বিশ্বমানের। চীনে এই ধরণের অঞ্চল গ'ড়ে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করার যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এগুলো অনেকটাই ভাবা হ'য়েছে সেই আদলে। তবে চীনে এই পরিকাঠামো গড়ার জন্য যে বিনিয়োগ তা এসেছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে। ভারতে এই বিনিয়োগ ঘটাবার কাজটা করবে বেসরকারী পুঁজি। বেসরকারী পুঁজি জমি পাবে বাজার দামে কিংবা তার চেয়ে কম দামে। জমির মালিক সে জমি বিক্রি করতে না চাইলে রাষ্ট্র প্রয়োজনে তা অধিগ্রহণ করে তাদের কাছে হস্তান্তর করবে। বাকী যা কাজ তা করবে বেসরকারী পুঁজি নিজে। বলা বাহুল্য, এসবের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, ছোট পুঁজিপতির পক্ষে সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা সম্ভবপর নয়। সে কাজটা এদেশে তাই করবে বড় বেসরকারী পুঁজি বা কর্পরেট ক্যাপিটাল। এছাড়া শপিং মল, হাউসিং কমপ্লেক্স— এসবের জন্য যে জমির চাহিদা আসছে, সে চাহিদারও উৎস হ'ল কর্পরেট ক্যাপিটাল। এ সবের জন্য যে বিনিয়োগ দরকার ছোট প্রমোটার বা পুঁজিপতির পক্ষে তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে জমির যে চাহিদা ইদানিং দেখা দিয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা তার বাইরে— যেখানেই তা দেখা দিক না কেন, তার মূলে আছে দেশী বা বিদেশী কর্পরেট ক্যাপিটাল।

কর্পরেট ক্যাপিটাল কেন এই জমির বাজারে পুঁজি বিনিয়োগে নেমে পড়েছে? বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা

'সজ' -এর কথাই ভাবা যাক। এরা কি জমি নিচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্পের পরিকাঠামো গড়ার জন্য? প্রচার যদিও সে রকমই, মনে রাখা দরকার—বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অধিগৃহীত জমির অর্ধেকই কাজে লাগানো হবে বাড়ী ঘর, শপিংমল, প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, সুইমিং পুল— এই সব গড়তে। এগুলোকে বলে 'রিয়েল এস্টেট' বা বাস্তু সম্পত্তি। সেজ-এর বড় একটা অংশে এসব গড়ে মুনাফা লাভের চেষ্টা করছে কর্পরেট পুঁজি। আর বিশেষ অঞ্চলের বাইরে যে জমির চাহিদা, তার পুরোটাই আসছে এই বাস্তু সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট গড়ার জন্য। কর্পরেট পুঁজি জমির বাজারে নেমে পড়েছে কারণ তাদের অনুমান, ভারতবর্ষে বাস্তু সম্পত্তির বাজার ক্রম বর্ধমান। এই ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কম্পানি মেরিল লিন্চ। এই কম্পানির হিসাবে, ২০০৫ সালে এদেশে বাস্তু সম্পত্তির বাজার ছিল ১২০০ কোটি ডলারের। কম্পানির অনুমান, ২০১৫ সাল নাগাদ এই বাজারের আয়তন হবে ৯০০০ কোটি ডলারের। কম্পানি ইতোমধ্যেই পাঁচ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে ব্যাঙ্গালোরে। মেরিল লিন্চ একমাত্র বিদেশী কম্পানি নয় যারা এই বাস্তু সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করছে। বাস্তু সম্পত্তির বাজারে মরগান্ স্টানলি ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছে ৬.৮ কোটি ডলার। জে.পি. মরগ্যান্ ৪০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করেছে, জি.ই. কমার্শিয়াল ফাইনান্স বিনিয়োগ করেছে ৬.৩ কোটি ডলার। এ ছাড়া আছে এদেশের বড় কর্পরেট পুঁজি, যারা জমির বাজারে 'ডেভেলপার' হিসেবে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। জমি অধিগ্রহণের যে ঢেউ উঠেছে, তার পিছনে আছে এই অনুমান যে বাস্তু সম্পত্তির বাজার এ দেশে ক্রমবর্ধমান আর এই ক্রমবর্ধমান বাজারে মুনাফা করতে হলে যে ভাবেই হোক, জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এ বাজার ছোট পুঁজির বাজার নয়। এখানে লড়ে জিততে হ'লে চাই পুঁজির জোর। জমির বাজারে ক্রেতার ভূমিকায় তাই নেমে পড়েছে দেশী বিদেশী কর্পরেট পুঁজি। এই নূতন বাজার গড়ে উঠেছে নয়া অর্থনীতি যুগ বা ভুবনায়নের যুগে। ১৯৯০ -এর দশক থেকে অকৃষি কাজে জমির ব্যবহারের প্রবণতা যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার পিছনে আছে বাস্তু সম্পত্তির এই নূতন বাজারের উদ্ভব।

বাস্তু সম্পত্তির বাজারে হঠাৎ এই জোয়ার আসার কারণ কি? নয়া অর্থনৈতিক নীতির দৌলতে এদেশে আয় বৃদ্ধির অসাম্য বাড়ছে। উচ্চমূল্যের পণ্য (সেবা পণ্য সহ) উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একদল ভারতীয়র হাতে টাকা আসছে বিপুল পরিমাণে। ব্যাঙ্ক, আই.টি., উচ্চ কারিগরি নির্ভর উৎপাদনে যুক্ত ম্যানেজমেন্ট প্রফেসনাল— এদের অনেকে এখন আন্তর্জাতিক মানে আয় ক'রে থাকেন। এছাড়া আছে ফটকাবাজারে বিনিয়োগের লাভের টাকায় হঠাৎ বড় লোক হওয়া একদল লোক, আছে দেশী ও বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত উদ্যোগপতি যারা বিশ্বায়নের সুবিধা নিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছেন। একশ কোটি মানুষের দেশে এরা যে সুবিপুল সংখ্যালঘু তাতে সন্দেহ নেই। তবে সংখ্যার হিসেবে এরা খুব কম নয়। বাজার নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের মতে এদের সংখ্যা অন্তত ১৫ কোটি । এই ১৫ কোটি ভারতীয় এবং তার সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়দের একটা অংশ— যার সংখ্যাও কম হবে না, এরা হ'য়ে উঠেছে বাস্তু সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্রেতা। এদের হাতে টাকা এবং এদের ভবিষ্যত আয়ের উপর নির্ভর ক'রে ব্যাঙ্কগুলিও স্বল্প সুদে টাকা ধার দেয় এদেরকে বাস্তু সম্পত্তি কেনার জন্য। যেহেতু এই ধারণা দৃঢ়মূল যে টাকা ব্যাঙ্কে রাখার বদলে বাস্তু সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে লাভ বেশি কারণ বাস্তু সম্পত্তি দাম মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ে, অর্থবান ব্যক্তিরা স্রেফ বসবাসের জন্যই বাস্তু সম্পত্তি কিনছেন না, তারা বাস্তু সম্পত্তি কিনছেন ভবিষ্যতে লাভ করার জন্যও। বাস্তু সম্পত্তির বাজারে যে জোয়ার এসেছে তার কারণ এটাই এবং কর্পরেট পুঁজি সেটা মাথায় রেখেই জমি কিনছে বা জমি অধিগ্রহণ করাচ্ছে বিপুলভাবে।

ক্ষতিপূরণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার

কর্পরেট পুঁজি যখন বাস্তু সম্পত্তির ব্যবসায় নামে, কৃষককে তখন তার জমি হারাতে হয়। কৃষি জমির ব্যবহার বদলায়। যে জমিতে চাষ হ'তো তা অকৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়; সে জমিতে বাড়ী ঘর, শপিং মল, কারখানা, সুইমিং পুল—এসব গড়ে ওঠে। সমাজের সামগ্রিক লাভ ক্ষতির বিচারে জমির ব্যবহারের এই পরিবর্তন ন্যায় সংগত কিনা, সেটি একটি জটিল প্রশ্ন। এই প্রবন্ধের সূচনায় আমরা দেখিয়েছি অকৃষি কাজে শ্রমিক পিছু উৎপাদন বেশী হয়, স্রেফ এই যুক্তিকে জমির ব্যবহারের যথেচ্ছ পরিবর্তন যুক্তিসংগত না হ'তেও পারে। অকৃষি কাজে জমির ব্যবহার বাড়ার ফলে যদি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, তবে এই অকৃষি কাজ - নির্ভর সমৃদ্ধি বজায় রাখাই অসম্ভব হ'য়ে পড়তে পারে। অকৃষি কাজে জমির ব্যবহার যখন বাড়তে থাকে, তখন দেখা দরকার এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হ'য়ে পড়ছে কিনা। যদি সে সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে অবশ্যই উচিত হবে অকৃষি কাজে জমি ব্যবহারের প্রবণতা রোধ করা। অকৃষি কাজে লাভ বেশি। কাজেই কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করা হোক— সমাজিক লাভ লোকসানের নিরিখে একথা এখন আর গ্রহণযোগ্য থাকে না।

ভারতে বাস্তু সম্পত্তির বাজারে ত্বরণ দেখা দেওয়ার কৃষি - জমির অকৃষি কাজে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত হতে বসেছে? খাদ্য শস্যের উৎপাদনে যে মন্থরতা দেখা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শিল্প ও পরিষেবায় যেখানে গড়পড়তা ১০ শতাংশের বেশী হারে উৎপাদন বাড়ছে কৃষিতে (খাদ্যশস্য) উৎপাদন বাড়ছে গড়পড়তা মাত্র ২ শতাংশ হারে (কোনো বছর বৃদ্ধির হার হ'য়ে পড়ছে ঋণাত্মক)। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন, অকৃষি কাজে জমির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যই এই অবস্থা হ'চ্ছে— এটা ঠিক কথা নয়। এদেশে নীট কর্ষিত জমির পরিমাণ মোটামুটি ১৪ কোটি হেক্টরেই থেকে গেছে। আসলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে বিনিয়োগ দরকার ভাটা দেখা দিয়েছে সেই বিনিয়োগেই। কথাটা আর একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। বেসরকারী উদ্যোগপতিরা কৃষিতে নূতন বিনিয়োগ করতে চায় না, কেননা অকৃষি কাজের তুলনায় কৃষিতে লাভ কম। নূতন বিনিয়োগ করতে পারে রাষ্ট্র। নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক চিন্তা যেভাবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বন্ধ করতে উঠে গড়ে লেগেছে, তাতে রাষ্ট্র এই বিনিয়োগ করবে, তার সম্ভাবনা কমছে। বস্তুতঃ এদেশে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ক্রমশ কমে আসছে এই নয়া

অর্থনীতির যুগে। যাঁরা এই প্রবণতা রোধ করতে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন সেই বামপন্থীরা এই নিয়ে কিছু করছেন, তথ্যে তার প্রমাণ নেই। কৃষক নেতারা যখন কৃষককে জমি বিক্রি ক'রে দিয়ে সেই বিক্রির টাকা ব্যাঙ্কে রেখে সুদের আয়ে সংসার চালাবার পরামর্শ দেন, তখন কৃষিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বামপন্থীরা আন্দোলনে নামবেন— এমন আশা করার সঙ্গত কারণও থাকে না। সুতরাং কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার মন্থরতর হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। এর ওপর আবার যদি কর্পরেট পুঁজি জমি গ্রাসের প্রতিযোগিতায় নামে তবে অদূর ভবিষ্যতেই এদেশে যে খাদ্য সংকট দেখা দেবে, সে কথা ভাবার কারণ থাকে।

কিন্তু সে যা-ই হোক, জমি যখন কৃষকের হাত থেকে কর্পরেট পুঁজির হাতে চ'লে যায়, ব্যক্তি কৃষক কীভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সমাজের সামগ্রিক লাভ লোকসানের হিসাব ক'রতে বসলে সে দিকটাও দেখা দরকার। কৃষিতে শ্রমিক পিছু উৎপাদন - মূল্য কম, অথবা জমি বিক্রির টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে লাভ বেশী—এসব হাল্কা কথায় সমস্যাটার গুরুত্ব কমানো সঙ্গত নয়। কঠোর বাস্তব হল, জমি হারালে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মধ্যযুগীয় লুঠপাটের যুগে এ সব ক্ষতি নিয়ে কী করা হতো, তা নিয়ে আলোচনার জায়গা এ প্রবন্ধ নয়। জমি থেকে উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীরা অপেক্ষাকৃত খারাপ জমিতে বসতি তুলে নিয়ে চলে যেতো। জমি যেহেতু পাওয়া যেতো বিনা পয়সায় বা সামান্য খাজনায়; এটা করা কঠিন হ'তো না। ক্ষতি তবুও হ'তো। তবে ক্ষতি যা হ'তো তার দায় ঐ জনগোষ্ঠীকেই নিতে হ'তো। রাষ্ট্র তাদের 'ক্ষতিপূরণ' দেবে, অথবা, যারা জমি দখল করছে তাদের আবার উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের দায় নিতে হবে—এসব কথা তখন উঠতো না। কথাটা উঠলো ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট বা আলোক প্রাপ্তির যুগে, যখন অপক্ষপাতী শাসন, অপক্ষপাতী বিচার, অপক্ষপাতী বিনিময় (transaction)—এসবের ধারণা সমাজকে আলোড়িত করলো। ইংল্যান্ডে যখন এনক্লোজার শুরু হয়, মধ্যযুগের সেই শেষ ধাপে বিতাড়িত কৃষকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেবার কথাই উঠতো না। কিন্তু সেই ইংল্যান্ডেই 'এনক্লোজার' -এর শেষ যুগে (অষ্টাদশ শতক এবং উনবিংশ শতকের প্রথম দিক) উৎখাত হওয়া কৃষকদের একাংশ (স্বাধীন বা ইউমান কৃষক) ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হ'লো (অনেকেই তা পায়নি। তারা নতুন গড়ে ওঠা শহরে পালালো, জাহাজ বোঝাই হ'য়ে উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হ'লো)। এই অধিকার দান হ'লো এনলাইটেনমেন্ট -এর অবদান, যা 'অপক্ষপাত' চায়। এই অপক্ষপাত -এর ফলশ্রুতিতে আসে এই কথাটা যে সমাজের কেউ কারও কোনো ক্ষতি করলে সেই ক্ষতি যাতে পুরণ করা হয় রাষ্ট্রকে তার আইন এবং বিচার ব্যবস্থা মারফৎ তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রকে হ'তে হবে সমদর্শী এবং সমাজ দাঁড়িয়ে থাকবে 'ইকুইটি' বা সমদর্শীর আদর্শর ওপর। ইকুইটি মানে 'ইকুয়ালিটি' বা সাম্য নয়। সাম্য'র জন্য লাগে বিদ্যমান আয় এবং সম্পদ বন্টনে পরিবর্তন। আধুনিকতার দর্শনকে প্রসারিত ক'রে সমাজতন্ত্রীরা যদিও এই ইকুইটিকে ইকুয়ালিটি দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, আধুনিক সমাজে এই ধারণা এখনও প্রধান ধারণা হ'য়ে ওঠেনি। আধুনিক সমাজ কিন্তু মধ্যযুগীয় লুঠপাঠের দর্শনকেও অনুমোদন করে না (যে কারণে জর্জ বুশকে ইরাক লুঠের বিষয়টাকে চাপা দিতে হয়, ইরাকে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্যই যে তারা লড়ছে, তা বার বার বলতে হয় তাকে)। আধুনিক সমাজ 'ইকুইটি বা সমদর্শিতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কৃষক যদি জমি হারায়, আধুনিক সমাজ চাইবে এর ফলে তার যে ক্ষতি হল, তা যেন পূরণ করা হয়। গা-জোয়ারী ক'রে এই জমি নেওয়া রিলায়েন্সের মতো বড় পুঁজির পক্ষেও সম্ভব নয়। কৃষককে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে।

বিতর্ক বা গোলমাল আছে এই ক্ষতিপূরণ নিয়েই। কে পাবে ক্ষতিপূরণ? ক্ষতির বদলে কী দেওয়া হবে? কতটা দেওয়া হবে? কৃষির ক্ষতি সত্যি সত্যিই পূরণ করা সম্ভব হয় কিনা, প্রশ্ন আছে সে সব নিয়েও। ভারতের বর্তমান পর্যায়ের জমি গ্রহণ বা জমিগ্রাস নিয়ে এ যে বিতর্ক হ'চ্ছে তার মূলেও আছে এই সব বিষয়গুলি। লক্ষ্য করা দরকার, এ সব বিতর্ক কেউ এড়িয়ে যেতে পারছে না। না পারার কারণ সমদর্শিতার আদর্শ এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে এই ন্যায় বিচার ধারণা আছে, এনলাইটেনমেন্ট উত্তর পৃথিবী তা এড়িয়ে যেতে পারে না। সাম্য নিয়ে এই পৃথিবী বিতর্ক করতে পারে, সমদর্শিতা নিয়ে বিতর্ক নেই।

সমদর্শিতা, কর্পরেট পুঁজি ও রাষ্ট্র

ক্ষতিপূরণ নিয়ে সব চেয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলে ক্ষতিপূরণ কে পাবে, তা ঠিক করা নিয়ে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যক্তির সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। জমি নিয়ে যে সম্পত্তির নিরাপত্তার কথা ওঠে, আধুনিক রাষ্ট্র তা বুঝতে চায় তার আইনের ভাষায়। জমির ওপর আইন সিদ্ধ সম্পত্তির অধিকার এদেশে যা আছে ব্রিটিশ যুগ থেকেই তা নিয়ে বহু সমস্যা আছে। জমি বিক্রি করা বা দান করা অথবা পুত্র কন্যার জন্য তা রেখে যাওয়ার অধিকার আছে সে জমির মালিক (Proprietor)। আইন অনুসারে, এই ব্যক্তি জমি চ্যুত হ'লে ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে তা পেতে হ'লে তার কাছে জমির দলিল থাকতে হবে এবং সরকারী খাতায় তা নথিবদ্ধ থাকতে হবে। জমিতে যে বসবাস করে, জমিতে যে চাষবাস করে, প্রথাসিদ্ধ অধিকার—যা সরকারী খাতায় নথিবদ্ধ নয়, তার জোরে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একপয়সা ক্ষতিপূরণও পাবে না আধুনিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে— কেন না রাষ্ট্রের যে ভাষা, আইনের ভাষা– সে ভাষায় এ অধিকার লেখা হয়নি। সুতরাং জমি বিক্রি হ'লে সেই চাষী এক পয়সাও পাবে না, যে সে জমির মালিক নয়, বর্গাদার, অথবা যে সে জমিতে খেত - মজুরের কাজ করে, সে -জমির ফসল ভ্যান রিক্সায় ব'য়ে নিয়ে যায় বা লড়িতে তুলে দয়ে। বর্গাদার যদি প্রমাণ করে যে সে নথিবদ্ধ বর্গাদার তাতেও কিছু হবে না, কেননা রাষ্ট্রে আইনে সে জমির মালিক নয়, তার অধিকার চাষের অধিকার। চাষ না থাকলে তার কোনো অধিকার নেই ও জমিতে। বামফ্রন্ট সরকার যখন নথিবদ্ধ বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ দেয়, আধুনিক রাষ্ট্রের দিক থেকে তা দাঁড়ায় মহানুভবতা; সেটা নিয়ে তার প্রচার চলে দেশ জুড়ে। বাস্তব সত্য হল সমদর্শী রাষ্ট্র প্রথম চোটেই ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের তালিকা থেকে জমির ওপর নির্ভরশীল নাগরিকদের একটা বড় অংশকে ছাঁটাই করে দেয়। সেটা করা হয় আইনসিদ্ধ উপায়েই এবং এনিয়ে কিছু

এন.জি.ও. ছাড়া চেঁচামেচি করার লোকও জোটে না। আধুনিক রাষ্ট্র এ বিষয়ে যে অবস্থান নেয়, এনক্রোজার-এর ইংল্যান্ড-এর 'কট্টর' চাষী থেরে সিঙ্গুরের অ-নথিবন্ধ বর্গাদার—সর্বত্রই তা সমান। ও ক্ষতিপূরণ পাবে না, কারণ ওদের কোনো 'বৈধ' অধিকার নেই জমিতে। বৈধ অধিকার না থাকায় বর্তমান পর্যায়ে কর্পরেট পুঁজির জমিগ্রাস -এ জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হ'চ্ছে বহু ভারতীয় সমদশী রাষ্ট্রর যা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

বৈধ অধিকার যার আছে, সে পাবে ক্ষতিপূরণ। ক্ষতির বদলে কী দেওয়া হবে? আধুনিক রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে কথা বলে বাজার অর্থনীতির ভাষায়। জমি একটি বাজারি পণ্য। বাজারে তা কেনা বেচা হয়। কেনা বেচার একটা দাম থাকে। ক্ষতিপূরণ বলতে বোঝায় সেই দামটিই। জমির মালিক যখন স্বেচ্ছায় জমি বিক্রি করে, তখন সে খোঁজে বাজারে চালু দাম। (আশেপাশে জমি যে দামে বিক্রি হ'চ্ছে) ওটা পেলেই ইকুইটিভিত্তিক ন্যায় বিচার পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে জমি বিক্রি হয় নিঃশব্দে, মালিকানা কাগজপত্র নীরবে হাত বদল হয়– রেজেস্ট্রি অফিসে তা নথিবদ্ধও হয়। হইচই বাঁধে জমি যখন অধিগ্রহণ করা হয়, তখন। হইচই হয়, কারণ যে বিক্রি করে তাকে জোর ক'রে বিক্রেতা বানানো হয়। জোর ক'রে তার ওপর জমির একটা দাম চাপানো হয়। সে দাম নিয়েও গোলমাল বাধে। জোর ক'রে যাকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়, তার জীবিকা কী হবে সেটা দেখার দায় রাষ্ট্রের থাকে না। জমির ওপর নির্ভরশীল ক্ষেতমজুরের ক্ষেত্রে যা, পরচা হাতে দাঁড়ানো কৃষকের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে। তার জীবিকা কী হবে কেউ জানে না— নিজে দেখে নাও। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষক হয়তো কিছু একটা বিকল্প খুঁজে বের করে (যদিও অভ্যাসের জগত থেকে বেরিয়ে আসা অনেক সময়ই কষ্ট সাধ্য হয় এবং এই চাপানো কষ্টের কোনো ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না), বিপদে পড়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, যারা এই বিকল্প খুঁজতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু অন্য কাজে তাদের প্রশিক্ষণ নেই, নূতন ক'রে কিছু করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। ঝুঁকি বহুল কোনো ব্যবসায় এই ক্ষতিপূরণের টাকা খাটানো মানস থাকে না তাদের। টাকা শেষ হ'য়ে যায় নিমেষে এবং তারপর 'অদক্ষ' শ্রমিকের মজুত বাহিনীতে যোগ দেয় এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। তীব্র বেকার সমস্যায় পীড়িত সমাজে এই মজুত বাহিনীর সদস্যবৃত্তি সামাজিক অসন্তোষ তৈরি করে। সমদর্শী রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় প্রথম দিকে। অসন্তোষ থেকে মার দাঙ্গা শুরু হ'লে রাষ্ট্র অবশ্য তার নখ দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই মানুষদের ওপর। এনলাইটেনমেন্ট -এর সমদর্শী রাষ্ট্রের আসল রূপ প্রকাশ পায় তখন। ওড়িশার কলিঙ্গনগর, মহারষ্ট্রের রায়গড় অথবা পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর - নন্দিগ্রাম—সর্বত্র ঘটেছে একই ঘটনা, শুধু স্থান - কাল - পাত্র ভেদে তার 'মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকে গেছে।

একথা যদি ভাবা হয় যে অধিগ্রহণের বদলে জমি হস্তান্তরের কাজ বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো, তাতে ক্ষতিপূরণ হবে সমদর্শিতার নীতিতে— সেটাও ভুল। অধিগ্রহণে বিক্রেতার ইচ্ছের দাম থাকে না, ফলত ক্ষতির মূল্য তার কাছে কত সেটাও বোঝা যায় না। ক্ষতির মূল্য যেহেতু বোঝা যায় না, দাম নিয়ে ক্ষোভ থাকতেই পারে। স্বেচ্ছায় বিক্রি করলে বুঝতে হবে ক্ষতির মূল্য কত বিক্রেতা তা বিবেচনা করেই জমিটি হস্তান্তরিত করছে। সে জানে ক্ষতি সে উশুল ক'রেছে জমির দাম থেকে (যে কোনো কেনা বেচা এই নিয়মে হবার কথা বাজার ব্যবস্থায়)। এ জন্য ইদানীং কথা উঠছে, অধিগ্রহণ আইন প্রয়োগ ক'রে জমি দখল করার দরকার নেই। বাজারের ওপর ওটা ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ কথাটাও ঠিক নয়। বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবস্থা হয় দুই বিঘা জমির উপেনের মতো। বস্তুত যে সব জায়গায় কর্পরেট পুঁজি হানা দিচ্ছে, সর্বত্র গড়ে উঠছে জমির এজেন্সি মার্কেট বা দালালির বাজার। প্রকৃত মালিক জমি হারাচ্ছে কর্পরেট পুঁজির সাইনবোর্ড দেখা দেবার অনেক আগেই। সিঙ্গুরে অধিগৃহীত জমির আশেপাশের বহু জমির ইতিমধ্যে এই দশা হয়েছে। দালালির বাজারে যে জমি বিক্রি হয়, কৃষক 'স্বেচ্ছায়' সে জমি দেয় বটে, তবে এই স্বেচ্ছা তৈরি করা হয় বাজার এবং বাজার বহির্ভূত ক্ষমতার নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে। সুতরাং এনলাইটেনমেন্ট প্রচারিত সমদর্শিতার আধুনিক দর্শনের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না এই জমিগ্রাসের অর্থনীতিতে।

সমাজতন্ত্রীরা যে সাম্য'র ওপর জোর দেয়, এন. জি.ও. মার্কা সমদর্শিতার ওপর তারা যে আস্থা রাখে না, তার কারণ এটাই। সমদর্শিতার আদর্শ - রক্ষা করার জন্য চাই সম্পদ এবং আয় বন্টনে সাম্য। এই সাম্যই ক্ষমতার বিভিন্ন রোধের ভিত্তি তৈরি করে। যতদিন তা না হয়, তত দিনই সমদর্শিতার বহিরঙ্গ রূপটি দাঁড়িয়ে থাকে অসমদর্শিতার মধ্যযুগীয় দর্শনের ওপর। আধুনিকতা তার ওপর সভ্যতার পোষাক পরায়। পোষাকটা অশালীন হয়ে পড়লে সিভিল সোসাইটির সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। রাষ্ট্র নানা কমিটি গড়ে পোষাকের শালীনতা রক্ষার উপায় খোঁজে। 'সেজ' নিয়ে প্রণব মুখার্জী কমিটির সুপারিশ সমকালীন জমিগ্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতির অশালীন মধ্যযুগীয় অঙ্গভঙ্গির ওপর এরকমই একটি শালীনতার পোষাক পরানোর আয়োজন।

উন্নয়ন কৃষককে তার চিরাচরিত জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে, এটা সামাজিক বিকাশের একটি আবশ্যিক নিয়ম। এই উচ্ছেদের সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নটি জড়িয়ে নেওয়াই আধুনিকতা। পুঁজিবাদ কোনোদিনই এটিকে জড়িয়ে নিয়ে উন্নয়নের পথ খোঁজে নি। কেননা তার বিকাশ চলে স্বতঃস্ফূর্ততার নিয়মে। এই নির্মম সত্যটি পাশ কাটানোর জন্যই এসেছে সমদর্শিতা নিয়ে আইন - কানুন, রাষ্ট্রনীতি, সিভিল সোসাইটির চাপ। সমাজতন্ত্র বাস্তবে এই উন্নয়ন ও উচ্ছেদের প্রশ্নটি কতটা আধুনিকতার দর্শন মেনে কার্যকর করেছে তা নিয়েও বিতর্ক আছে। কিন্তু তার জন্য এটা ধরে নেবার কারণ নেই যে পুঁজিবাদ যা করছে, সেটাই ঠিক। সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় এই দার্শনিক প্রত্যয় একথা বলে যে সমদর্শিতার জন্য চাই সাম্য। যেহেতু সমাজতন্ত্রে ভিত্তি হল সাম্যবাদী দর্শন, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ চালিত সামাজিক শক্তিই এই সমস্যার মানবিক সমাধান খুঁজে পেতে পারে।